The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 75-89

ISSN 2306-3920

বাংলা ছোটোগল্প : দেহোপজীবী নারী

তাসনুমা জামান*

[**সার-সংক্ষেপ :** সভ্যতার প্রাচীন পেশাসমূহের মধ্যে টিকে থাকা অন্যতম এক পেশার নাম গণিকাবৃত্তি। সাধারণত এই পেশায় অর্থের বিনিময়ে নারীর দেহ ও যৌনতা বিক্রি হয় পুরুষের কাছে। সাহিত্য যেহেতু সময় ও সমাজকে ধারণ করে সেহেতু দেহজীবী নারীদের জীবনাচরণও এখানে উপস্থাপিত হয়। সাহিত্যের অন্যতম শাখা ছোটোগল্পে এই পেশা-সংলগ্ন মানুষের জীবনকথা স্থান লাভ করেছে। দেহজীবী নারীর চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন অর্থাৎ সামগ্রিক বিষয়কে বাংলা ছোটোগল্পকারগণ তাঁদের লেখনিতে ধারণ করেছেন। দেহজীবী নারীকে ছোটোগল্পে উপস্থাপন করার নিমিত্তে লেখকগণের সমাজের কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা অন্ধকারে আলোকপাতের ফলে দেহজীবী নারীকে নিয়ে অনেক নির্মম ও অপ্রিয় সত্য বাংলা ছোটোগল্পে স্থান লাভ করেছে। দেহজীবী নারীকেন্দ্রিক কয়েকটি ছোটোগল্পের বিশ্লেষণ করে দেহজীবী নারী-জীবনের নানা মাত্রা, নানা বৈশিষ্ট্য, তাদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিতকরণই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।]

বিশ্বসংস্কৃতির ধারায় পেশা হিসেবে পতিতাবৃত্তির ইতিহাস সুপ্রাচীন। সভ্য সমাজের ঘৃণা সেই সঙ্গে অপরিহার্যতা সমান্তরালে চলেছে এই পেশাকে কেন্দ্র করে। দেহদানের বিনিময়ে বহুজনের সম্ভোগ-লিপ্সাকে চরিতার্থ করে অর্থ উপর্জন বা জীবিকা নির্বাহকারী নারীগণই দেহজীবী নারী হিসাবে বিবেচিত। যদিও শিষ্ট-অশিষ্ট বিচিত্র সমার্থক শব্দেও তাদের পরিচয় মেলে, যেমনঃ অগ্রু, অজ্জুকা, অতিস্কদ্বরী, অবিদ্যা, আধিয়া সাই, অসতী, ইত্বরী, কচি, কড়ে রাঁড়ি, কসবি, কুম্ভা, কামরেখা, কুম্ভাদাসী, কুলটা, ক্ষুদ্রা, খাঁউ, খানকি, গণিকা, গণেরু, ছেনাল, ঠুমকি, দেহজীবী, দেহপসারিনী, দেহোপজীবিনী, নগরকুলবধূ, নগরনটী, নগরশোভিনী, নটী, নৈশবালা, পতিতা, প্রমোদবালা, পুংস্কামা, পাতুরিয়া, প্রেষণী, ফেরি, বর্ণদাসী, বর্বটি, বারবনিতা, বারবধূ, বারাঙ্গনা, বেশ্যা, ভোগ্যা, ভাতি, মকর, রজয়িত্রী, রক্ষিতা, রাণ্ডি, বারবিলাসিনী, বিনোদিনী, ব্যভিচারিণী, রাঁঢ়, রূপজীবিনী, রঙ্গনটী, রামা, লঞ্জিকা, সঞ্চারিকা, সাঙার, স্বৈরিণী, আর পি (রেজিস্টার্ড প্রসটিটিউট), স্ট্রামপেট, স্ট্রিট ওর্য়াকার, হার্লট, হাসলার, হুকার, হোর ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এই পেশায় সম্পৃক্ত নারীদের ভালোবাসাহীন অপমানিত জীবনের কায়িক শ্রমকে সম্মান জানাতে 'যৌনকর্মী' হিসাবে সম্বোধন করা হয়। (দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬ : ৭)

মানব-সভ্যতার একেবারে উষাকাল থেকেই দেহ-ব্যবসার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোতেও এই বৃত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়া, মিশরীয়, সিন্ধু, চীন, রোমান, গ্রিক, মায়া সভ্যতাগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। উল্লিখিত এই সভ্যতাগুলোতে শরীর-

---

* **ড. তাসনুমা জামান :** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ব্যবসার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কারণে এই পেশাকে আদিমতম পেশা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মেসোপটেমিয়ার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে দেহ-ব্যবসার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই সভ্যতায় দেহ-ব্যবসা ধর্মের ছায়াতলে পরিচালিত হতো। মন্দিরের ছত্রছায়ায় এই ব্যবসা চলত বলে তা ছিল আইনসিদ্ধ। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালেও নিষিদ্ধ কাজকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ধর্ম ছিল এক অন্যতম মাধ্যম, ঠিক বর্তমানের মতোই। মেসোপটেমিয় সভ্যতায় মন্দিরের অভ্যন্তরে সেবাদাসীদের শারীরিক সৌন্দর্য ভোগ করার সুযোগ পেত সে সব পুরুষেরা যারা মন্দিরে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম ছিল, তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এসব সেবাদাসীদের এই কাজ সম্পাদনে কখনও বলপ্রয়োগ করা হতো না। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য *দি এপিক অব গিলগামেশ* যা মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় রচিত, সেখানে দেহব্যবসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন চীনের যৌনব্যবসা ছিল আইন স্বীকৃত, কারণ সেখানে যৌনমিলনকে মনে করা হতো আত্মার উন্নতির অন্যতম সোপান। প্রাচীন চীনে যৌনপল্লিসমূহকে অন্যান্য ব্যবসার মতো নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার পাশাপাশি তাদের খাজনাও দিতে হতো। প্রাচীন চীন সভ্যতায় নারীদের সমান্তরালে পুরুষ যৌনকর্মীও ছিল সহজলভ্য। যৌনকর্মী এবং তাদের গ্রাহক– উভয়েই সমাজে সম্মানের অধিকারী ছিল, এমনকি রাজবংশের সদস্যরাও যৌনপল্লিতে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ লাভ করত। প্রাচীন চীনের সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকামিতা, উভকামিতায় অংশগ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন চীন সভ্যতায় যৌনতাকে অবাধ প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে পতিতালয়সমূহ চৈনিক-সভ্যতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল।

প্রাচীন গ্রিসেও দেহব্যবসার প্রচলন ছিল। তৎকালীন গ্রিসের নিয়ম ছিল– যে-কোনো পুরুষ সাবালক হলে তাকে পূর্ণ নাগরিকত্ব দেওয়া হতো, যার ফলে সেই ব্যক্তি অর্জন করত বিশেষ কিছু অধিকার, সেসবের মধ্যে অন্যতম ছিল অর্থের বিনিময়ে শরীর ভোগের স্বত্ব। প্রাচীন গ্রিসে দেহব্যবসাকে প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। সেখানে দেহ ব্যবসাকে গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার কারণে গ্রিস সমাজব্যবস্থায় 'সেক্সুয়াল স্কুল' এর প্রচলন ছিল যেখানে মেয়েদের দেহ বিক্রির কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো যাতে তারা এই পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। গ্রিসে দেহজীবী নারীদের বলা হতো 'পর্নাই', এই শব্দের অর্থ যে নারীকে ক্রয় করা যায় অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য নারী, আর এই 'পর্নাই' থেকেই ইংরেজি শব্দ 'পর্ন' এর উৎপত্তি। (বিশ্বজিৎ সাহা ২০২২ : ৯৯)। সভ্যতার বিকাশে ভারতেও গণিকাবৃত্তির ধারা লক্ষ করা যায়। মেসোপটেমিয়ার দেবী ইসতারের মন্দিরে সেবাদাসী প্রথার যে ধারা গড়ে উঠেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রাচীন ভারতে। সেখানেও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মন্দিরে দেবদেবীদের পূজার জন্য সেবাদাসীদের নিয়োগ দেওয়া হতো। তারা নিজেদের উৎসর্গ করত দেবতাদের সেবায়। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বাধ্য হয়েই তারা এই বৃত্তিতে অংশ নিত। শুরুতে এই 'সেবাদাসী' ধারণা বিশুদ্ধভাবে মানা হলেও সময়ের প্রবহমানতায় মানুষের রিপুর দংশনে এই প্রথায় পরিবর্তন সাধিত হয়, দেব-দেবীর সেবায় নিয়োজিত রাজ্যের রূপবতী নারীগণ প্রথমে পুরোহিত, তারপর রাজা, এরও কিছুকাল পর রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আমলাগণের সেবায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। শুরুতে সেবদাসীগণ এই কাজ বাধ্য হয়ে করলেও পরবর্তীকালে অর্থের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নেয়, আর ঠিক তখন থেকেই মন্দির-অভ্যন্তরের গোপন প্রকোষ্ঠে অঙ্কুরোদগম ঘটে দেহব্যবসার বীজের যা পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায়।

সাহিত্য জীবনের বিচিত্র রূপকে ধারণ করে বলেই প্রাচীন সভ্যতায় উত্থিত গণিকাবৃত্তি নামক পেশাটি সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যে তো বটেই আধুনিক সাহিত্যেও দেহজীবী নারীদের জীবন-চর্যা চিত্রিত হয়েছে, তবে কখনও তা মহিমায়, কখনও শ্লেষে আবার কখনও করুণায়। বাল্মীকির *রামায়ণে*, বেদব্যাসের *মহাভারতে*, *ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণে*, *উপনিষদে*,

মৎস্যপুরাণে দেহজীবী নারী এসেছে গণিকারূপে, কখনও স্বৈরিন্ত্রীরূপে, কখনও পুংশ্চলীরূপে। কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে পতিতাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তন্ত্র সাধনায়ও গণিকার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাৎসায়নের *কামসূত্রে* বিস্তৃতপরিসরে দেহজীবী নারীর বিচিত্র ধরন বিন্যাসিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও গণিকার কথা এসছে গ্রামীণ জনপদ, টিলা ও পর্বতের প্রেক্ষাপটে। চর্যাপদের দুই, তিন, চার, দশ, আঠারো, আঠাশ, তেত্রিশ নম্বর পদগুলোতে কখনও সরাসরি আবার কখনও পরোক্ষভাবে দেহজীবী নারীর কথা পদকর্তাগণ উল্লেখ করেছেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেহজীবী নারীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে* কৃষ্ণের রাধাকে নটকী, ছিনাল ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করার কারণে ধারণা করা যায় যে, সেই সময়েও বারাঙ্গনাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*, দোনাগাজী চৌধুরীর *সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল*, আবদুল হাকিমের *লালমতি সয়ফুলমুলুক* কাব্যেও দেহজীবী নারীদের পদচারণা লক্ষণীয়।

ইংরেজদের আনুকূল্যে আঠারো শতকের শেষের দিকে বাংলা অঞ্চলের কিছু মানুষের হঠাৎ ধনী হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের লাগামহীন জীবনযাপনে বাঙালি সমাজে এক বিধ্বংসী আলোড়ন তৈরি হয়। বাৎসায়নের *কামসূত্রে* যে বাগানবাড়িতে যাওয়াকে প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, বাস্তবে তারই প্রতিস্থাপন ঘটেছিল তৎকালীন কলকাতায়। সে চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশায়।* ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* এ কলকাতার নবাব-বাবুদের বহুগামিতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পে উনিশ শতকের সায়াহ্নে বা বলা যেতে পারে বিশ শতকের সূচনাকালে দেহজীবী নারীরা বিশেষ সহানুভূতি পেতে শুরু করে। তখন সংবেদনশীল আধুনিক লেখকগোষ্ঠী অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের যাপিত জীবনের কথাকে সাহিত্যে স্থান দিতে বদ্ধপরিকর হন, সেই সঙ্গে এই লেখকগোষ্ঠী জীবনের কঠোর বাস্তবতা আর জৈবিক প্রবৃত্তির প্রাবল্যকেও সাহিত্যে উপস্থাপনে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেহজীবী নারী বাংলা ছোটোগল্পে ঠাঁই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সামসময়িক এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য সাহিত্যিকগণের ছোটোগল্পে দেহজীবী নারী এসেছে পরম অন্তরঙ্গতায়। তাদের জীবনের লাঞ্ছনা, অবহেলা আর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের অব্যক্ত কষ্টকে বাণীরূপ দিয়েছেন তাঁরা। বাংলা ছোটোগল্পে একদিকে যেমন গণিকাজীবনের মর্মন্তুদ জীবনকাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে তেমনি অপরদিকে তাদের এই পেশা বেছে নেওয়ার কারণও উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা রয়েছে। মূলত দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বৈধব্যবরণ, বিবাহবিচ্ছেদ, প্রেমে ব্যর্থতা, কখনও স্বামী আবার কখনও প্রেমিকের দ্বারা প্রতারণা, উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ ইত্যাদি কারণে নারী পরিণত হয় দেহজীবী নারীতে। একজন নারী যখন ভোগ্যার জীবনে পদার্পণ করে তখন হতেই তার জীবন হয়ে ওঠে সমস্যাসঙ্কুল। তারা সমাজের অস্পৃশ্য হলেও তাদের কাছে গমনকারীরা ঠিকই সমাজে স্থান পায়। ১৯১০-১৯৩০– এই সময়ে কলকাতার হাড়কাটা ও সোনাগাছি– এই দুইটি নিষিদ্ধ এলাকার অভিজ্ঞতায় পুষ্ট মানদা দেবীর জবানীতে তা স্পষ্ট:

> যাঁহারা আমাদের জীবনকে সুখময় মনে করেন– আমাদের সংস্পর্শে আসিতে আগ্রহান্বিত– তাঁহারা বুঝিবেন এ পৃথিবীতে যদি নরক থাকে তবে তাহা আমাদের জীবন। আমি সমাজের ঘৃণিত, অস্পৃশ্যা– সমাজে আমার স্থান নাই, কিন্তু যে সকল সাধু-বেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতে তাঁহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। (কুমারী শ্রীমতি মানদা দেবী ১৯৮৬ : ৬)

আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। বাঙালি জীবনের নানা বিবর্তনের আলেখ্য ছোটোগল্পের শিল্পরূপে আশ্রয় করে নিশ্চিত এক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্পের মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে, বৈচিত্র্যের বিপুলতায়, আঙ্গিক-নিপুণতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সার্থক বাংলা ছোটোগল্পের জনক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটোগল্পের সীমারেখায় পদ্মাপারের স্নিগ্ধরূপ, নগর-জীবনের অস্থিরতা, মানবিক-সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি দেহজীবী নারীর কথাও এনেছেন, *বিচারক* এমনই একটি গল্প। আলোচ্য গল্পে ক্ষীরোদা একজন বারনারী। আটত্রিশ বছরের গতযৌবনা ক্ষীরোদাকে তার বাঁধা বাবু যখন ত্যাগ করে তখন সে তার পিতৃপরিচয়হীন শিশুকে নিয়ে আত্মহত্যার নিমিত্তে কুয়ায় ঝাঁপ দিলে ছেলেটি মৃত্যুবরণ করলেও ক্ষীরোদা বেঁচে যায়। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সেশনে চালান করে দিলে জজ মোহিতমোহন দত্ত তাকে ফাঁসির সাজা প্রদান করেন। সাজা প্রদানের দুই-একদিন পর জেলখানার বাগান থেকে সবজি সংগ্রহ করতে গিয়ে জজ মোহিতমোহনের ক্ষীরোদা সম্বন্ধে আগ্রহ জাগে। ক্ষীরোদা তার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করে অনুতপ্ত হয়েছে কিনা তা জানতে গিয়ে মোহিতমোহন এক নতুনতর সত্যের মুখোমুখি হন। প্রহরীর সঙ্গে কলহের কারণ অনুসন্ধানে জজ সাহেব জানতে পারেন ক্ষীরোদার স্বর্ণের আংটি প্রহরী নিয়েছে এবং প্রহরীর থেকে সেই আংটি যখন মোহিতমোহনের হাতে আসে তখন তিনি আংটির পেছনে খোদাই করা নাম 'বিনোদচন্দ্র' দেখতে পান। এই নাম তাকে অতীত মনে করিয়ে দেয়। কারণ উল্লিখিত অভিধা ব্যবহার করে মোহিতমোহন প্রায় পনেরো বছর বয়সের বিধবা হেমশশীকে ছলনা করে পথে বের করে এনেছিলেন। এই আংটিটি তখন তিনি হেমশশীকে উপহার দেন। নিজের ভোগলিপ্সাকে চরিতার্থ করার পর হেমশশীকে ত্যাগ করলে বালিকার স্থান হয় পতিতালয়ে, ক্ষীরোদা নামে। সেই আংটি পুনরায় হাতে নিয়ে মোহিতমোহনের মনে হয়:

> তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদায় রহিয়াছেঃ বিনোদচন্দ্র। তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতি সুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল, সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৩ : ৫)

ছোটো একটি হৃত অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবনিতার পরিচয়ের অন্তরালে বিরাজিত এক প্রেমময়ী নারীর স্বরূপকে উন্মোচিত করেছেন। যে প্রেম তাকে প্রতারিত করে গৃহলক্ষ্মী থেকে বারাঙ্গনায় পরিণত করেছে, সে প্রেমকেই হেমশশী হৃদয়ে লালন করেছে। তাই মোহিতমোহনের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পতিত নারী তারই কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে দেবী প্রতিমায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য গল্পে একজন গণিকার জীবনের পঙ্কিলতাকে ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত তার প্রেমকেই সত্য করে তুলেছেন। যেমন:

> মোহিত তার একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমনী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৩ : ৭)

চিত্তরঞ্জন দাসের *ডালিম* গল্পটি বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় দেহজীবী নারীর জীবনকেন্দ্রিক একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। উত্তম পুরুষের জবানিতে আলোচ্য গল্পের সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নির্যাতিত একজন নারীর বাধ্য হয়ে গণিকাবৃত্তি বেছে নেওয়ার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সমাজ কর্তৃক বর্জনীয় পদার্থের মতো ছুড়ে ফেলে দেওয়া দেহজীবী নারীর মনের গহীনে উত্থিত ভালবাসাকে হত্যা করে

হারিয়ে যাওয়ার বাস্তবচিত্রও আলোচ্য গল্পে চিত্রিত হয়েছে। *ডালিম* গল্পের নাম চরিত্র ডালিম, পেশায় বারাঙ্গনা। আর গল্প-কথক আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত চল্লিশোর্ধ একজন ব্যক্তি। কোনো এক বাগানবাড়িতে রাতের মজলিশে ডালিমের সঙ্গে কথকের সাক্ষাৎ হলে তিনি ডালিমের প্রেমে বাঁধা পড়েন এবং উপলব্ধি করেন এই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে ডালিমের প্রাণের যোগ নেই। রাতের গভীরতায় লতাকুঞ্জে বসে কথকের আপাপবিদ্ধ ভালোবাসায় ডালিমের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে গেলে কথক জানতে পারেন এতিম ডালিম মামা-মামির সংসারে আশ্রিত ছিল। ষোল বছর বয়সে পঞ্চাশ বছরের দোজবর বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হলে ডালিম শ্বশুরবাড়ি এলেও কাঙ্ক্ষিত সুখ তার অধরাই ছিল। শারীরিক ও মানসিক পীড়ন অসহনীয় হলে ডালিম পাড়ারই এক ছেলের সঙ্গে মামার বাড়ি ফিরে এলে সেখানে তার ঠাঁই জোটে না, পুনরায় শ্বশুরবাড়ি পৌঁছালে শাশুড়িও সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলে সেই ছেলেটি তাকে কলকাতা নিয়ে আসে। সপ্তাহব্যাপী এক সঙ্গে থাকার পর পুরুষ সঙ্গীটি ডালিমকে ত্যাগ করলে ডালিমের স্থান হয় লালবাতি পাড়ায়, ডালিম রূপান্তরিত হয় কলকাতার 'ডালিম'-এ। ডালিমের ভাষায়:

> আমার শাশুড়ি উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামির কথা মনে পড়িল, 'গোল্লায় যাও', আমি ফিরিলাম। দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে [...] বলিলাম, 'আমি গোল্লায় যাব। যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাও'। [...] মনে হইল, যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোনও অদৃশ্য বলিদান মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।
>
> তারপর!
>
> এখন আমি কলকাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। শহরের বড়লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। [...] আমি কলকাতার ডালিম কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি। বুক যে জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়? (চিত্তরঞ্জন দাস ১৪০৩ : ১১)

গল্পকার *ডালিম* গল্পে পারিবারিক অসহযোগিতার কারণে পঙ্কে নিমজ্জিত অসংখ্য নারীর গণিকায় পরিণত হওয়ার কাহিনি ব্যক্ত করেছেন। মূল্যবান অলঙ্কার, বাক্সভরা টাকা, শাড়িপূর্ণ আলমারি থাকা সত্ত্বেও ডালিমরা সুখ-শান্তি-স্বস্তিতে থাকতে পারে না। সম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপনের প্রবল আকুতি তারা হৃদয়-গভীরে বহন করে। তাদের সুসজ্জিত সাজ-পোষাক, কৃত্রিম হাসি মানুষ দেখতে পায় বটে কিন্তু অঙ্গারের মত জ্বলতে-পুড়তে থাকা তাদের হৃদয়কে অনুভবে আনতে ব্যর্থ হয় সভ্য সমাজ।

ছয় পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট *আঁধারে আলো* গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেহজীবী নারীকে নিয়ে রচিত একটি অবিস্মরণীয় গল্প। আলোচ্য গল্পটিতে বৃত্তি হিসেবে দেহ-ব্যবহারের চিত্র শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-বলয়ে প্রথম যুক্ত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে রহস্যময়ী নারী বিজলীকে দেখে এম এ পরীক্ষার্থী সত্যেন্দ্র উন্মাদের মতো তার প্রেমে পড়ে। কিন্তু নর্তকী বিজলীর লক্ষ্য ছিল সত্যেন্দ্র'র সঙ্গে ছলনা করে তাকে বোকা বানিয়ে বিকৃত আনন্দ আহরণ। বিজলীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট:

> [...] মাথা খাস গাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান নই, খ্রীস্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এতবড় ধাড়ি মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা– কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল ত? বিয়ে করবি বলে, না ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে? ভারি একটা হাসি উঠিল। (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪০৩ : ২৭)

বিজলীর প্রকৃত পরিচয় না জেনেই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সত্য যে তাকে মন দিয়েছিল তা আসলে তার কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই বহিঃপ্রকাশ। তাই বিজলী যে রঙ্গনটী তা জানার পরই সত্য'র ভালাবাসা উঠে যায়, সত্য'র উক্তিই তার প্রমাণঃ

> আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে, কিন্তু আপনারও ভুল হচ্ছে। আজ নয়, আগামী জন্মে নয়– কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না, অনুমতি করুন, আমি যাই– আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪০৩ : ২৮)

সত্যেন্দ্রর রূঢ় বক্তব্যে বিজলী অকস্মাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের ভেতরের বিশুদ্ধ ভালবাসাকে উপলব্ধি করতে পারে। বিজলী নর্তকী হলেও নারী, ছলনার খোলসে সর্বদা নিজেকে ঢেকে রাখলেও মনের গহীনে প্রকৃত ভালবাসা পাওয়ার অদম্য এক টান তারও ছিল। তাই তার নির্মম প্রত্যাখ্যান ও প্রস্থানের পর বিজলীর নবজন্ম ঘটে। লেখকের ভাষায়ঃ

> বিজলী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী। [...] ঘন্টাখানেক পর যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত, অর্ধমৃত নারী প্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। [...] হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মতো তাহার দু'পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।
> একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?
> বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পরব না বলে, অর্থাৎ?
> অর্থাৎ আর না। বাঈজি মরেছে। (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪০৩ : ৩০)

বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আলোচ্য গল্পে শরৎচন্দ্র উপস্থাপন করেছেন বিজলী-সত্যেন্দ্রর এককালের সম্পর্ককে যা একজন নর্তকীর মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা সৃষ্টি করেছে, বাইজি-জীবনকে শেষ করে বিজলী তার ধ্যানের দেবতার আরাধনা করেছে। (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ২০০৫ : ৫৪)

বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আবির্ভূত অন্যতম গল্পকার জগদীশ গুপ্ত। কল্লোলগোষ্ঠীর রোমান্টিক ভাবালু জীবনদৃষ্টি থেকে জগদীশ গুপ্ত বাংলা গল্পকে এক রুক্ষ, নির্মোহ, অন্ধ নিয়তি-তাড়িত হতাশাময় জনহীন দেশে স্থানান্তরিত করেছিলেন যেখানে আর্ত মানুষ নিরুপায়, অসহায় হয়ে হাহাকারে ভেঙে পড়ে। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৪ : ৩৩৪)। *কল্লোল*, *প্রগতি*, *কালিকলমে*র যুগে জগদীশ গুপ্ত যখন গল্প লিখতে শুরু করেন তখন বাংলা গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের অপরাধপ্রবণ মনের গ্লানির সঙ্গে রোমান্টিকতার এক অদ্ভূত মিশেল। জগদীশ গুপ্ত তাঁর সাহিত্য-জগত নির্মাণে এই রোমান্টিকতাকে এড়িয়ে রূঢ় বাস্তবতাকে অবলম্বন করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যে মানুষের ভেতরকার অবদমিত বাসনা, স্বার্থবুদ্ধি ও চক্রান্তের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। নিয়তি ও যৌনবৃত্তিকে সমস্ত শাসনের অতীত এক অবারিত শক্তির প্রকাশ হিসেবে তিনি তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন। (সমরেশ মজুমদার ২০১২ : ৬২)। তাই পতিতা নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে তিনি একজন বারাঙ্গনার ভেতরকার প্রেম বা সতীত্ববোধের অনুসন্ধান না করে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে তাকে তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপস্থাপন করেছেন। *রসাভাস* গল্পে এই বোধেরই প্রমাণ মেলে। সূর্যমুখী পুরনারী হলেও সাংসারিক কাজে আগ্রহ না থাকায় এবং বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ায় স্বামী মুকুন্দ এবং তার শাশুড়ির গঞ্জনায় সে সংসার ত্যাগ করে। যবনিকার আড়ালে বয়স্ক গৌরগোপাল দত্ত ও সূর্যমুখীকে নিয়ে যে রসালাপের সৃষ্টি হয়, সংসার ছেড়ে এসে সূর্যমুখী প্রকাশ্যে সেই কলঙ্ককে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ না থেকে, গৃহকর্মে পটিয়সী না হয়ে অর্থ উপার্জন সূর্যমুখীর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বের। তাই ধনী গৌরগোপালের চোখে পড়ে তার প্রতিপাল্য হওয়ার আমন্ত্রণ সূর্যমুখী সাদরে গ্রহণ করেছে। লেখকের বক্তব্যেঃ

> সূর্যমুখীর ভাগ্যোন্নতির সূত্রপাত ঐখানেই অর্থাৎ তাহার গৌরগোপালের চোখে পড়িবার আর চোখে ভালো লাগিবার ইতিহাস ঐ। [...] এক কথায় অগ্নির সহায় যেমন বায়ু, ইচ্ছার সহায় তেমনি টাকা। টাকা চাই-ই দুর্দিনের জন্য চাই, সুদিনকে ফুটাইবার জন্য চাই, পরকে দেখাইবার জন্য চাই, নিজে দেখিবার জন্য চাই। সুতরাং আরো দুদিন সহিয়া থাকিয়া সূর্যমুখী পরম গুরুপতিকে পা দেখাইয়া মায়ের কাছে চলিয়া আসিল। (জগদীশ গুপ্ত ১৪০৩ : ৩৯)

বাস্তবতার নির্মোহ চিত্র উপস্থাপন জগদীশ গুপ্তের লক্ষ্য ছিল বলে তাঁর সূর্যমুখী গৌরগোপালে আটকে থাকেনি। বহুগামিতার অমোঘ আকর্ষণের যে বীজ মানুষের হৃদয়ের কৃষ্ণগহ্বরে লুকায়িত থাকে তারই উপস্থিতি ঘটেছে সূর্যমুখী চরিত্রে, তাইতো গৌরগোপালকে আর তার ভালো লাগে না। অবস্থা এমন হলো যে, তাকে দেখলেই সূর্যমুখীর বিবমিষা জাগে,

> সূর্যমুখী মনে মনে একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, তারপর একটু ছটফট করিল– তারপর এমন হইল যে, গৌরগোপালের কথা ভাবিতে গেলেই বিতৃষ্ণায় তার মুখ যেন আপনিই অন্যদিকে ফিরিয়া যায়।
> এমন সময় তার দেখা হইয়া গেল হৃদয়নাথের সঙ্গে। (জগদীশ গুপ্ত ১৪০৩ : ৪০)

জগদীশ গুপ্তের শৈশবের অনেকটা সময় কেটেছে গণিকাপল্লির গণিকাদের সংস্পর্শে। জগদীশ গুপ্তের মায়ের সঙ্গে এই পল্লির কোনো কোনো নারীর সুসম্পর্কও ছিল। ফলে গণিকাদের জীবনযাত্রা, তাদের স্বভাব খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল জগদীশ গুপ্তের। আর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই সূর্যমুখীর সৃষ্টি। বিরূপ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে দেহজীবী নারীদের মধ্যে যে কলহ-প্রবণতা তৈরি হয় সেই বৈশিষ্ট্যও সূর্যমুখীতে বিদ্যমান। তাই হৃদয়নাথের সঙ্গে সূর্যমুখীর রসময় সম্পর্ক তৈরি হলেও কলহের সময় নীরবাসিনী ও হৃদয়নাথকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতে সূর্যমুখীর এতটুকু বাধেনি। যেমন:

> যেখানে অতি সুন্দর সূর্যমুখীর নির্ব্বিবাদে ফুটিয়া থাকিবার কথা, সেখানে এই হৃদয়ভেদী ছেঁড়াছিঁড়ি চলিতেছে দেখিয়া হৃদয়নাথের হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। [...] সূর্যমুখী তাহাকে একেবারে নিরাশ না করিয়া দিয়া অন্ধ রাগের মাথায় পরম শত্রু নীরবাসিনীকে তাহারই দিকে লেলাইয়া দিলো– চম্পক অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল, ঐ যে বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা না নিয়ে ঘরে, আট গণ্ডা ভরতি হোক–। (জগদীশ গুপ্ত ১৪০৩ : ৪৭)

পুরুষের কাছে নারী শুধুই ভোগের সামগ্রী– সামাজিক এই চেতনাকে জগদীশ গুপ্ত *রসাভাস* গল্পের মাধ্যমে আঘাত করেছেন। আলোচ্য গল্পে নারীর কাছে পুরুষই হয়েছে ভোগ্যবস্তু। তাই সূর্যমুখী স্বামীর ঘর ত্যাগ করে দেহজীবী নারীতে পরিণত হয়। গৌরগোপালে কিছুদিন মজে থেকে হৃদয়নাথকে কাছে টেনে নিয়ে আবার হৃদয়নাথের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে চুরমার করতেও তাকে দ্বিধান্বিত হতে দেখা যায় না। সমাজস্থ পুরুষকে নারী-হৃদয় নিয়ে তাচ্ছিল্যের যে ক্রিয়ায় মেতে থাকতে দেখা যায় *রসাভাস* গল্পে একজন বারাঙ্গনার মাধ্যমে জগদীশ গুপ্ত এর বিপরীত চিত্র অঙ্কন করেছেন।

অনন্য-সাধারণ গল্পরীতির কারণে বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। হাস্যরসের আড়ালে, ঘটনার নির্ভরতায়, ঘটনা ও চরিত্রের পরিপূরকতায় তাঁর গল্প-জগৎ নির্মিত। হাস্যরস প্রভাতকুমারের ছোটোগল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলেও গুরুতর বিষয়কে গুরুত্বের সাথে তিনি উপস্থাপন করেছেন। ফলে দেহজীবী নারীর জীবন, সমাজে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর চিন্তাজগত থেকে বাদ পড়েনি বিধায় দেহজীবি নারীও তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছে। দেহজীবী নারীকে নিয়ে লিখিত তাঁর অন্যতম একটি গল্প *কাশিবাসিনী*।

কাশিবাসিনী গল্পটি স্বাদে ও রসে কিছুটা আলাদা। ষোলো বা সতেরো বছরের আশপাশের সময়ে কাশীবাসিনীর পদস্খলন ঘটে এবং সে তার একমাত্র মেয়েকে রেখে ভোগ্যার জীবন বেছে নেয়। আলোচ্য গল্পে মূল চরিত্র তিনটি নামহীন কাশিবাসিনী, তার মেয়ে মালতী ও মালতীর স্বামী গিরিন্দ্রনাথ। খগোল নামক স্থানের দানপুর স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রের স্ত্রী মালতীর সংসারে একদিন হঠাৎ করে এসে হাজির হয় একজন কাশীবাসিনী প্রৌঢ়া বাঙালি নারী। কাশী যাবার টিকিট হারিয়ে যাওয়ায় তিনি ট্রেন থেকে নামতে বাধ্য হন এবং পরের গাড়ি রাত একটায় হওয়ায় অপরিচিত হলেও গিরীন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় নেন। মালতী নিঃসঙ্গ থাকার কারণে প্রৌঢ়ার নানাবিধ প্রশ্ন ও আলাপচারিতা তার ভাল লাগে। আর কাশীবাসিনীও সুকৌশলে মালতীর স্বামীর খবর জেনে নেন:

> ত্রিশ টাকা।
> তাছাড়া উপরি আয় আছে?
> মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, 'কি জানি।
> কাশীবাসিনী একটু খুশী হইলেন। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ২৫)

মালতীর এই ভাল-মন্দের খবর জেনে নেওয়ার কারণ বাৎসল্য রস, বহু বছর আগে কাশীবাসিনীর ছেড়ে যাওয়া সন্তান মালতী। কন্যার ভবিষ্যৎ আর্থিকভাবে সুনিশ্চিত করা, তাকে ঘরের কাজে উপযোগী করে সংসারে স্থিতি আনয়নে নিপুণ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই কাশীবাসিনীর কন্যাগৃহে আগমন। গিরীন্দ্রের মনে তাকে নিয়ে নানা সন্দেহ জাগলেও কাশীবাসিনী গিরীন্দ্রের মনোভাবকে গুরুত্ব না দিয়ে কন্যার সংসারে কিছুকালের জন্য অবস্থান করেছে শুধুমাত্র মালতীকে সচ্ছল সংসারের উপযোগী করে দেওয়ার জন্য। মাতৃত্বের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল তাইতো ঘটনার পরম্পরায় মালতীর গহনার বাক্স ট্রেনের কামরায় হারিয়ে গেলে গিরীন্দ্রের অভিযোগে কাশীবাসিনী পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় জরিমানা দিয়ে মুক্তি পাওয়ার পর সে পুনরায় তার যাবতীয় গহনা নিয়ে আসে মালতীকে দেওয়ার জন্য।

> আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল। [...]
> –আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব?
> –আমি দিচ্ছি।
> –আপনি দিচ্ছেন, আমি কোন অধিকারে নেব? সে আমি পারি না। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ২৬)

এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত সৃষ্টি করে লেখক কাশীবাসিনীর জীবনের লুকায়িত সত্যকে উন্মোচন করলেন তার সন্তানের সম্মুখে। কাশীবাসিনী জানাতে বাধ্য হলেন, 'তা হলে জান আমি পোড়ারমুখী মা।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ২৬)। কাশীবাসিনীর যেমন মাতৃহৃদয়ে লুকায়িত ছিল অতৃপ্ত সন্তান বাৎসল্য ঠিক তেমনি মালতীরও মাকে কাছে পাবার ছিল আকণ্ঠ পিপাসা। মা ভ্রষ্টা জেনেও তাকে দেখার বাসনা অবচেতনে ধারণ করেছিল মালতী। যখন দেখা হল তার মায়ের সঙ্গে, তখন মনে পড়ে গেল তার মা কুলত্যাগী, মাকে তার অস্পৃশ্যের মতো মনে হলো। নিজের অজান্তেই সে মায়ের থেকে দূরে সরে বসল, আবার পরক্ষণেই মায়ের চরণ স্পর্শ করে কাঁদতে লাগল। প্রভাতকুমার এই গল্পে একজন গণিকা-সন্তানের মাকে নিয়ে দ্বিধান্বিত মনোভাবের অনুপুঙ্খ চিত্র এঁকেছেন। যেমন:

> তুমি হঠাৎ এসে পড়োনি, জেনেশুনে এসেছিলে, কেন ?
> মালতির স্বর এখন কঠোর।
> কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?
> [...] কেন তুমি জানালে তুমি কে ?
> কি জানি। থাকতে পারলাম না।

> মালতী আবেগ ভরে একবার বলিতে যাইতেছিল–জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মাকে ত কখনো চক্ষে দেখিতে পাইতাম না।
> মালতী আর থাকিতে পারিল না। 'মা আবার দেখা দিও'– বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।
> 'সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও'– বলিয়া মা কন্যাকে আর্শীবাদ করিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ২৬)

একজন বারাঙ্গনার সন্তান-বাৎসল্যের এক মোহনীয় রূপকে লেখক আলোচ্য গল্পে চিত্রিত করেছেন। দেহজীবী নারীরা মা হয়েও মা নয়, গৃহস্থের সংসারে তাদের ঠাঁই নেই, সংসারের ওপারে দাঁড়িয়ে সংসার করার তৃষ্ণাকে বুকে নিয়ে কাশীবাসিনীদের সংসার ত্যাগ করতে হয়।

মাতৃত্বের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে দেহজীবী নারীর বেঁচে থাকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের *বাইজি*। *কাশীবাসিনী*র মত *বাইজি* গল্পের মূল চরিত্র নামহীন নয়। তিনি আনোয়ারি বাই নামে পরিচিত। গজল, ঠুংরি-খেয়ালের সুরে তবলার বোলের তালে পা মিলিয়ে তিনি আসরকে মাতোয়ারা করেন। বাইজি হওয়ার আগে মনের মানুষের সঙ্গে সত্যিকারের সংসার পাতার আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন মোতি, তার মেয়ে। আনোয়ারি বাই কখনও চাননি তাঁর মেয়ে বাইজি হোক, তাই মেয়েকে তিনি দত্তক দেন। তার জীবনযাপনের প্রভাব যেন মেয়ের জীবনে না পড়ে সেজন্য মেয়ের সঙ্গে তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেননি। এমনকি মোতির দত্তক মা তার বিয়ে ঠিক হওয়ার খবর জানানোর পরও তিনি সেই বিয়েতে যাননি। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত মেয়ের বিয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা শুনে অশ্রুবিসর্জনকেও আটকাতে পারেননি। আরও কয়েক বছর পর আনোয়ারি বাই যখন শুনলেন তার মেয়ে ও মেয়ের আর্মি অফিসার স্বামী লক্ষ্মৌ বদলি হয়ে এসেছে তখন তিনি তার নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে মোতিকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন তারই শুভাকাঙ্ক্ষী মনোহরপ্রসাদের কাছে। কার্যভার গ্রহণকালে মোতির স্বামী বাড়ির ল'নে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছিলেন শহরের জাঁদরেল লোকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য, সেখানেই আনোয়ারি লুকিয়ে উপস্থিত হন দূর থেকে মেয়েকে এক নজর দেখার জন্য। কিন্তু সেখানে না গেলেই আনোয়ারির জন্য তা ভালো হতো। কারণ মোতির বেশভূষা দেখে মেয়েকে নিয়ে মায়ের মনে যে ভদ্রস্থ গৃহিণীর ছবি অঙ্কিত ছিল তা এক নিমিষে চূর্ণ হলো। এই মেয়েকে তিনি চেনেন না। মোতির শান্ত-সমাহিত স্বভাবের পরিবর্তে যে উগ্র বিলাসিনী চটুল রূপের আবির্ভাব হয়েছে তা অবলোকন করে তিনি বিস্মিত, হতবাক ও বাকরুদ্ধ। তার মনে হলো মেয়েকে দত্তক পাঠিয়েও বংশগতির ধারাকে তিনি আটকাতে পারেননি। বাইজি বাড়িতে শৈশব কাটানো মোতির অবচেতনে বাইজি স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য প্রোথিত হয়েছিল প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই আনোয়ারির সকল চেষ্টাই তার নিজের কাছে নিষ্ফল মনে হচ্ছে:

> মনোহরপ্রসাদের টনক নড়ল আচমকা মনিবন্ধে টান পড়তে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আনোয়ারি বাই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর। [...] বাইজির মেয়ে বাইজিই হয়ে রইল। ছেলেবেলা থেকে কাছছাড়া করেও রক্তের দোষ ছাড়াতে পারলাম না। পোশাক-আশাক, রঙ ঢঙ চালচলনে এ সবে চকের রাস্তায় দাঁড়ানো বাইজিদেরও যে হার মানাল! এ কি হল ভাইসাব এ আমার কি হল। (হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ২২০)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেহজীবী নারীকে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ছোটোগল্পে পতিতা কখনও এসেছে মহত্ত্ব নিয়ে, কখনও অপ্সরাসুলভ ছলনা নিয়ে, আবার কখনও অসহায়ত্ব নিয়ে। কিন্তু বিভূতিভূষণের সৃষ্ট সংসার-স্খলিত নারীদের মনে হয় তারা যেন ঘরের

আটপৌরে মেয়ে। পৃথিবীর আদিমতম পেশায় নাম লিখেও তাদের অকৃত্রিম সারল্য, ভক্তি আর ভালবাসা হৃদয়কে স্পর্শ করে। বিভূতিভূষণ সামগ্রিক জীবনবোধের শিল্পী বলেই জীবনের খণ্ডিতাংশের ভালো বা মন্দের সীমারেখাকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাই তাঁর সৃষ্ট হাজু বা কুসুম বারাঙ্গনা হলেও এই পার্শ্বিক জীবনের একাংশের পঙ্কিলতা তাদের গ্রাস করেনি। ফলে বারবনিতা হয়েও তারা যেন বিভূতি-সাহিত্যে গৃহস্থ-তনয়া রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এহেন হাজু বা কুসুম সৃষ্টিতে লেখকের জীবনবোধও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, বিভূতিভূষণের মননে এই বোধ ক্রিয়াশীল ছিল যে:

> যে জগতকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেঁয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে– সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী যাহার গতিকল্প হইতে কল্পন্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০২ : ২৮২)

দুঃখকে যিনি অমৃতের পাথেয় ভাবতে পারেন তাঁর পক্ষেই সম্ভব জীবন-পঙ্কে পদ্ম প্রস্ফুটিত করা, আর সে কারণেই *বিপদ* গল্পের হাজু বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় একটি অনবদ্য দেহজীবী-চরিত্র হিসেবে রূপলাভ করেছে। উত্তম পুরুষে বর্ণিত *বিপদ* গল্পে কথকের পাড়ার মেয়ে হাজু পেটুক হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়, ছেলে কোলে ভিক্ষা করে, কখনও খাবার চুরি করে নিজের ক্ষুণ্নবৃত্তি নিবারণ করে। নির্বোধ, সরল হাজুর কাছে খাওয়াটাই মুখ্য বিষয়, খাদ্য গ্রহণের মধ্যে হাজু বিপুল আনন্দ লাভ করে, যেমন: 'নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনের খাওয়া দেখিতে হয়।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৩ : ৯৩)

মানুষ, প্রকৃতি, স্রষ্টা নিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্য পরিব্যপ্ত হলেও দেশকালের তীব্র সংকটকেও তিনি অস্বীকার করেননি। ফলে মানুষের শোক-দুঃখ-ক্লেশের পাশাপাশি মানুষেরই তৈরি ব্ল্যাক মার্কেট, মন্বন্তর মূল্যবোধের অবক্ষয়ে উদ্বিগ্ন বিভূতি-মানসের প্রতিফলন ঘটেছে বেশ কিছু ছোটোগল্পে। *বিপদ*ও তার মধ্যে অন্যতম। (শ্রাবণী পাল ২০০৮ : ২২)

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পদচিহ্নে গ্রামবাংলার অনেক অসহায় নারীর মত হাজুও নাম লেখায় বেশ্যাবৃত্তিতে। বনগাঁ পতিতাপল্লীর সাড়ে সাত টাকা ভাড়ার ছোট একটি ঘরে গড়ে তোলে তার আবাস। কিছুদিন পর গল্পকথকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় হাজু জোর করে তাকে তার ঘরে নিয়ে যায়, গর্ব করে নিজের পরিচয় দেয়:

> [...] বলিলাম– কে হাজু? সে হাসিয়া বলিল–আপনাদের গাঁয়ের। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি। এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য গর্ব অনুভব করে। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৩ : ৯৫)

গাঁয়ের জ্যাঠামশাইকে হাজু এমনভাবে আপ্যায়ন করে মনে হয় যেন বাপের বাড়ির গ্রামের কেউ তার নিজের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। হাজু তার নিজ জগতের নিজ সামর্থ্যে কেনা ছোটো ছোটো জিনিসগুলো পরম মমতায় লেখককে দেখায়, গাঁয়ের খোঁজ-খবর নেয়, নিজ হাতে চা বানিয়ে, ভালো ভালো খাবার আনিয়ে জ্যাঠা মশাইকে সমাদর করে। পতিতা জীবনের দুঃখ বা গ্লানি হাজুর আচরণে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের কঠোর বাস্তবতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েও হাজুর অন্তরে কাঁদার ছিটেফোঁটাও লাগেনি। পতিতা নিয়ে সামাজিক যে ট্যাবু রয়েছে, হাজু যেন এসব থেকে শতহস্ত দূরে। তাইতো সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্যাঠামশাইকে তার ঘরে সাদর সম্ভাষণ জানায়:

> [...] একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়। এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর! গা ঘিন-ঘিন করিয়া উঠিল। বলিলাম – না। এখন কিছু খাবো না। সময় নেই–
> হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল– তা হবে না। সে আমি শুনচিনে [...]
> (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৩ : ৯৫)

পৃথিবীর আদিমতম পেশায় যুক্ত থেকেও কর্মের কদার্য অনুভূতি হাজুকে প্রভাবিত করতে পারেনি। যাপিত জীবনের আবিলতাকে অতিক্রম করে সর্বব্যাপী আনন্দ-মূর্ছনার যে সন্ধান বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন সে সত্যকেই তিনি হাজুর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তথাকথিত পতিতা-জীবনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে আলোচ্য গল্পে হাজু স্বতস্ফূর্ত চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। কারণ তার স্রষ্টা অযাচিত জ্ঞানভার অথবা দায়ভার কোনোটাই তার উপর চাপিয়ে দেননি।

দুর্ভিক্ষের পীড়নে পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রির করুণ বাস্তবতা লিপিবদ্ধ হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নমুনা* গল্পে। আলোচ্য গল্পে মন্বন্তরের ফলে জীবন রক্ষার তাগিদে কেশব তার কন্যা শৈলকে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। জঠরের ক্ষুধার আগুনে পুড়ে যায় কেশবের পিতৃধর্ম। তাই নারীব্যবসায়ী কালাচাঁদের নিকট হতে কেশবের মেয়ে শৈলকে ক্রয়ের প্রস্তাব যখন আসে তখন পিতা হিসেবে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কালাচাঁদ যখন কয়েক বস্তা চাল আর কয়েকটি কাপড়ের বিনিময়ে শৈলকে নিতে আসে তখন কেশবের নিস্তেজভাবে আলোড়ন জাগে। মেয়ে-বিক্রির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করার মতো মানসিক দৃঢ়তা না থাকায় কেশব শেষ পর্যন্ত শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী রেখে বিয়ের মন্ত্রপাঠ করে শৈলকে কালাচাঁদের হাতে তুলে দেয়। কেশবের এই আচরণের মাধ্যমে একজন জন্মদাতার অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের এক প্রান্তে রয়েছে কেশব ও তার সংকটাপন্ন পরিবার, অপর দিকে রয়েছে কালাচাঁদ আর মন্দোদরীর মতো অর্থলোভী, মনুষ্যত্বহীন ব্যবসায়ী। কালাচাঁদ ও তার ভ্রাতৃবধু মন্দোদরী দুইটি ভাড়াবাড়িতে সতেরো, আঠারোটি মেয়েকে নিয়ে দেহব্যবসা চালায়। গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আঘাত তীব্রতর হওয়ায় নামমাত্র মূল্যে ও সহজ উপায়ে কালাচাঁদ পল্লিঅঞ্চল হতে নারী সংগ্রহ করে। কারণ শহরে তখন মেয়েদের চাহিদা বাড়ছে। শৈলও সেভাবেই তার হাতে আসে। শৈল'র বাবার বিয়ের মন্ত্র পাঠ কালাচাঁদের অবচেতনে প্রভাব ফেলায় শৈলকে নিয়ে তার ভেতর সূক্ষ্ম অনুভূতির সঞ্চার ঘটে। কিন্তু অর্থের সামনে তার এই সাময়িক অনুভব মিলিয়ে যেতেও সময় লাগেনা। তার অনুপস্থিতিতে মন্দোদরী শৈলের ঘরে খদ্দের প্রবেশের অনুমতি দিলে কালাচাঁদ ক্রোধান্বিত হলেও একতাড়া নোট দেখে সে পুনরায় শান্ত হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রূঢ় বাস্তবতার নির্দয় রূপকেই প্রতিভাত করেন। যেমন:

> শৈলির ঘরে লোক আছে।
> কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।
> লোক আছে। আমার বিয়ে-করা স্ত্রীর ঘরে-
> মন্দোদরী নিঃশব্দে একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুনতে আরম্ভ করল। গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠান্ডা হয়ে গেছে। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১০৯)

যে-কোনো সামাজিক দুর্বিপাকে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে নারীকে রূপান্তরিত হতে হয় সস্তা পণ্যে এবং তাদের নিয়ে চলে দেহব্যবসা। অস্তিত্বের সংকটে নারী ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ *নমুনা* গল্পকে করেছে তাৎপর্যমণ্ডিত। সমাজ জীবনের প্রবল সংকটে নারীকে বাধ্য হয়ে

যে লাঞ্ছনাময় দেহজীবীর জীবন বেছে নিতে হয়, সত্যের সেই নির্মম রূপ আলোচ্য গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অবক্ষয়ের অস্থিরতায় বাংলা কথাসাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব। অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, কৃত্রিম মর্যাদাবোধের মুখোশে ঢাকা মধ্যবিত্ত বাঙালির সুবিধাবাদী চরিত্র, ব্যতিক্রমী মানব মনের অতলান্তিক ক্লেদাক্ত মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বর্ণনায় সুবোধ ঘোষের *বারবধূ* একমুখীন লক্ষে ব্যঞ্জনাপ্রধান ছোটোগল্প। (শশাঙ্কশেখর মণ্ডল ২০১১ : ১২৭)

বারবধূ গল্পের মূল সঞ্চালিকা তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি ওরফে লতা জমিদার প্রসাদ রায়ের রক্ষিতা। তারই মনোজগতে প্রবেশ করে তাকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন লেখক। লতা অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রি করে, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ারের বোতল, সিগারেট, কুরুচিপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত পর্দার আলোড়নে প্রসাদ আর লতার আসর বসে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রসাদ রায়ের অনুরোধে লতাকে তার স্ত্রী সেজে প্রতিবেশীদের আপ্যায়ন করতে হয়। ক্ষণিকের জন্য তাকে হতে হয় প্রসাদবধূ। চওড়া পাড়ের তাঁতের শাড়ি, পায়ে সরু আলতা, সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান নিয়ে লতা সামাজিক-সৌজন্যে, লৌকিকতায় প্রতিবেশীদের মন জয় করে নেয়, বারংবার গৃহবধূর অভিনয় করতে গিয়ে দেহজীবী লতার হৃদয়ে এক নতুনতর ভাবের সৃষ্টি হয়। বারনারী থেকে কূলবধূ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় লতার মধ্যে। যে লতা গৃহলক্ষ্মীর অভিনয় করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেছিলঃ

> [...] নাঃ, আর পারি না। তোমার ভদ্দোরপনার ভড়ং করতে গিয়ে বারবার বাইরের লোকের কাছে ঢঙ দেখাতে পারব না। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর-বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকব কেন? থিয়েটার খাটলে দু-দশশো হত। (সুবোধ ঘোষ ১৪০৩ : ২১৯)

সেই লতাই কপট বধূবৃত্তির নির্মোক ছেড়ে নিজেকে সংসারের কর্ত্রী ভাবতে শুরু করে,

> সর্ব সামর্থ যেন খসে পড়ে গেছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে লতা, শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে, ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই ছদ্ম চরিত্রটার ওপর বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে। ভাঙতে পারে না, এই মূর্তিকে ভাঙবার চেষ্টাও করতে পারে না, বোধ হয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না! কোনও উপায় নেই। (সুবোধ ঘোষ ১৪০৩ : ২২৮)

বারনারীর পরিচয় ভুলে লতা হয়ে ওঠে গৃহবধূ। নারীর মনের চিরন্তন অভিপ্রায়– একজন বিশেষ পুরুষকে কেন্দ্র করে ঘর বাঁধবে, সংসার সাজাবে, গৃহের কর্ত্রী হবে– এই চিরায়ত বোধ লতাকে আবর্তিত করে, ক্ষণিকের জন্য লতা নিজের পরিচয় ভুলে গৃহিণী হওয়ার নেশায় নিমজ্জিত হয়। কিন্তু আভার আবির্ভাবে প্রসাদ রায় যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় লতার প্রকৃত অবস্থা তখন তার পদার্পণ ঘটে স্বপ্নের রঙিন পৃথিবী থেকে বাস্তবতায়। আলোচ্য গল্পে সংসারকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার আজন্ম লালিত সাধ যে একজন বারবনিতারও থাকতে পারে লতার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠক সহজেই তা অনুভব করতে পারে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের *সংসার সীমান্তে* পতিতা জীবন নিয়ে রচিত একটি মানবিক ছোটোগল্প। অঘোর এক রাতে তাড়া খেয়ে পতিতা রজনীর ঘরে ঢুকে এক টাকার বিনিময়ে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় সেই টাকাটি চুরি করে পালায়। অঘোর পালিয়ে গেলেও রজনীকে ভুলতে না পেরে পুনরায় রজনীর ঘরে এলে ক্ষিপ্ত রজনী তাকে আঘাত করে আহত করলে পুলিশের ভয়ে তার সেবাযত্নের ভার রজনীকেই নিতে হয় এবং তারা মনের দিক দিয়ে পরস্পরের কাছে চলে আসে, স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধার। রজনীর

বাড়িওয়ালীর টাকা শোধ করার জন্য অঘোর শেষবারের মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জেল হয়, যা রজনী জানতেও পারে না। জীবন চালানোর প্রয়োজনে রজনীকে আবার খদ্দেরের জন্য পথে নামতে হয়। অবক্ষয়িত সামাজিক-ধারায় তারা প্রান্তিক মানুষ হয়ে সংসার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে, সংসার করার স্বপ্ন অঘোর-রজনীর অধরাই থেকে যায়। অর্থনৈতিক টানাপড়েনের দায় এড়াতে সমাজস্থ অসহায় মানুষের স্বপ্ন যে স্বপ্নই থেকে যায়, আলোচ্য গল্পের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে সেটাই উপস্থাপিত হয়েছে। তাই গল্পের সমাপ্তিতে লেখক অঘোর-রজনীর পরিণতিকে অপরিসীম সহানুভূতিতে চিত্রিত করেছেন। যেমনঃ

> অঘোর দাস এখনও জেলে পচিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনো নিশ্চয় কলিকাতার একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরাসিনের ডিবিয়ার ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিয়ার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনো নিশ্চয় বিগত যৌবনা রূপহীনা রজনী একরাত্রের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতিক্ষা করে। (প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৮৯ : ১৭৫)

এছাড়াও জ্যোতির্ময়ী দেবীর *চিরকালীন*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মেলা*, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মন্দলোক*, অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের *ইতি*, বুদ্ধদেব বসুর *চোর! চোর!*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর *ট্যাক্সিওয়ালা*, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের *বিদ্যুৎলতা*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *এক্সিবিশন*, বিমল করের *আঙুরলতা*, রমাপদ চৌধুরীর *সুর্মা*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *স্বপ্নপরী*, সমরেশ মজুমদারের *নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো* ইত্যাদি গল্পসমূহে বারবণিতাদের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

গণিকা ও গণিকাবৃত্তি নিয়ে রচিত বাংলা ছোটোগল্প বিশ্লেষণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমনঃ এক. পতিতাকেন্দ্রিক বাংলা গল্পে একজন নারীর বারাঙ্গনার জীবন বেছে নেওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি সেই পেশার গ্লানিময় রূপান্বেষণ করা হয়েছে, যেমনঃ *বিচারক*, *ডালিম*, *নমুনা* ইত্যাদি। দুই. কিছু ছোটোগল্পে দেহজীবী নারীর জীবনযাপনের বাহ্যিক চটুলতা উপস্থাপিত হলেও তার অন্তরের বিষাদ তরঙ্গায়িত হয়েছে, যেমনঃ *আঁধারে আলো*, *বারবধূ*। তিন. বাংলা ছোটোগল্পে চিত্রিত দেহজীবী নারীর মধ্যে সংসারে মনোনিবেশ করার আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়, যেমনঃ *সংসার সীমান্তে*, *বারবধূ* ইত্যাদি। চার. কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে জন্ম-নেওয়া সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে অনেক গল্পে, উদাহরণস্বরূপ নাম নেওয়া যেতে পারে *কাশিবাসিনী*, *ডালিম* ইত্যাদি গল্পের। পাঁচ. বাংলা ছোটোগল্পে এমন অনেক দেহজীবী নারী চরিত্রের আগমন ঘটেছে যারা সমাজের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান করে নিজস্ব চাহিদা ও চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমনঃ *রসাভাস*, *বিদ্যুৎলতা* ইত্যাদি। ছয়. ক্লেদাক্ত জীবনে পতিত হলেও দেহোপজীবিনীর মনুষ্যত্ব বজায় রাখার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে কয়েকটি গল্পে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মেলা*, *আঙুরলতা* ইত্যাদি। সাত. কোনো কোনো গল্পে একজন বারাঙ্গনা পঙ্কিলতাকে অতিক্রম করে জীবনের স্বতস্ফূর্ত রূপে অবগাহন করে মনের পবিত্রতাকে বজায় রেখেছে, যেমনঃ *বিপদ*।

সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় দেহজীবী নারীর জীবনজগৎ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল ও মানবিক। তাদের দেহ-যৌন-ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপস্থাপিত হয়েছে বাংলা ছোটোগল্পকারগণের সৃষ্টিতে। বারবনিতাগণও মানুষ, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার তাদেরও আছে, আছে প্রেম, বাৎসল্যবোধ, পরিবার সৃষ্টির প্রাকৃতিক অভিপ্রায়– এসব মানিবক বিষয়বস্তু অত্যন্ত মমত্বের সঙ্গে বাংলা ছোটোগল্পের মানচিত্রে চিত্রিত হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৪), *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর,* ১৮৯১-২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (২০০৫), *গল্প পাঠকের ডায়ারি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

কুমারী শ্রীমতি মানদা দেবী (১৯৮৬), *শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, দি ভার্সেটাইলস্, কলকাতা

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৪০৩), 'ডালিম', *বারবনিতাদের গল্প* (সম্পাদক : বারিদবরণ ঘোষ), মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

জগদীশ গুপ্ত (১৪০৩), 'রসাভাস', *বারবনিতাদের গল্প* (সম্পাদক : বারিদবরণ ঘোষ), মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৬), *বাই-বারাঙ্গনা গাথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১১), 'কাশীবাসিনী', *মন্দ মেয়ের গল্প,* (সম্পাদক : সুচিত্রা ভট্রাচার্য ও উজ্জ্বলকুমার দাস), প্রিয়া বুক হাউজ, কলকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৮৯), 'সংসার সীমান্তে', *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প,* ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০২), *বিভূতি রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

(১৪০৩), 'বিপদ', *বারবনিতাদের গল্প* (সম্পাদক : বারিদবরণ ঘোষ), মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

বিশ্বজিৎ সাহা (২০২২), *সভ্যতায় শরীর*, শব্দ প্রকাশন, কলকাতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৮), 'নমুনা', *শ্রেষ্ঠ গল্প* (সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ) অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৩), 'বিচারক', *বারবনিতাদের গল্প* (সম্পাদক : বারিদবরণ ঘোষ), মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৪০৩), 'আঁধারে আলো', *বারবনিতাদের গল্প* (সম্পাদক : বারিদবরণ ঘোষ), মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

শশাঙ্কশেখর মণ্ডল (২০১১), ''সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ': চেনা ছন্দ অচেনা সুর'', *সুবোধ ঘোষ : অযান্ত্রিক শিল্পী*, (সম্পাদক : উত্তম পুরকাইত), উজাগর, হাওড়া

শ্রাবণী পাল (২০০৮), *বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

সমরেশ মজুমদার (২০১২), *জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (২০১১), 'বাইজি', *মন্দ মেয়ের গল্প,* (সম্পাদক : সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও উজ্জ্বলকুমার দাস), প্রিয়া বুক হাউজ, কলকাতা

[**Abstract :** Among the ancient professions of civilization, one that has persisted is prostitution. Generally, this profession involves the exchange of money for a woman's body and sexuality, offered to men. Since literature reflects time and society, the lives of women engaged in this profession have also been portrayed in it. In the short stories of Bengali literature, one of its significant branches, the lives of people associated with this profession have

been depicted. Bengali short story writers have captured the thoughts, behavior, dress, and overall aspects of sex workers in their writings. By shedding light on the hidden corners of society, many harsh and unpleasant truths about sex workers have found a place in Bengali short stories. This paper aims to identify various dimensions, characteristics, and social positions of sex workers by analyzing some notable Bengali short stories centered on their lives.]